بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৬ জুন, ২০২৩ মোতাবেক ১৬ এহসান, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মক্কার কাফিরদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির বৃত্তান্ত কিছুটা তুলে ধরা হয়েছিল। এর কিছুটা বিস্তারিত চিত্র হলো, উমাইয়্যা বিন খালাফ নামে এক ব্যক্তি ছিল আর আরেকজন ছিল আবু লাহাব। (মক্কায়) যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল তখন তারা যুদ্ধে যেতে কিছুটা ইতস্তত করেছিল। এর বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে যে, কুরাইশ নেতারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ যুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার জন্য দাবি ও চেষ্টা করছিল, কিন্তু উমাইয়্যা বিন খালাফ যুদ্ধে যেতে অনীহা দেখাচ্ছিল। মক্কার এক নেতা উকবা বিন আবু মুআয়েত উমাইয়্যার কাছে আসে এবং তার সামনে সুগন্ধিপাত্র ও ধূপকাঠি রেখে বলে, হে আবুল আলা! তুমি মহিলাদের সুগন্ধির ঘ্রাণ নাও কেননা তুমিও মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত, যুদ্ধের সাথে তোমার কিসের সম্পর্ক? আরেক রেওয়ায়েত অনুসারে আবু জাহল উমাইয়্যার কাছে আসে এবং তাকে বলে, তুমি মক্কার নেতা এবং সম্মানিত লোকদের একজন। যদি লোকেরা তোমাকে যুদ্ধ থেকে পিছু হটতে দেখে তাহলে তারাও যাবে না। তাই এক দু'দিনের দূরত্বই হোক তুমি অবশ্যই আমাদের সাথে চলো; এরপর না হয় ফিরে এসো। উমাইয়্যা মূলত যুদ্ধে যেতে একারণে ভীত ছিল যে, তার নিহত হওয়ার বিষয়ে মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং এ বিষয়টি তার জানা ছিল। যেমন বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ বিন মুআয উমরার উদ্দেশ্যে (মক্কায়) যান এবং তিনি উমাইয়্যা বিন খালফের বাড়িতে অবস্থান করেন। উমাইয়্যার সাথে তার পূর্ব পরিচয় ছিল। উমাইয়্যার অভ্যাস ছিল, যখন সিরিয়া অভিমুখে যেত এবং মদীনার (পাশ দিয়ে) যেতো তখন হযরত সা'দ এর বাড়িতে অবস্থান করত। উমাইয়্যা হযরত সা'দ (রা.)-কে বলে, একটু অপেক্ষা করো। তিনি উমরা করতে চাচ্ছিলেন। সে বলে, আপাতত কিছুটা অপেক্ষা করো। দুপুরবেলা মানুষজন যখন অন্যমনস্ক থাকবে তখন গিয়ে তওয়াফ করে নিও। মুসলমানদের বিরোধিতার কারণে এই সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল। দ্বিপ্রহরে যখন হযরত সা'দ (রা.) তওয়াফ করছিলেন তখন তিনি আবু জাহলকে দেখতে পান। সে (আবু জাহল) বলতে থাকে, তওয়াফকারী কে? হযরত সা'দ বলেন, আমি সা'দ। আবু জাহল বলে, তুমি কি মনে করো, নিরাপদে কা'বাগৃহ তওয়াফ করবে অথচ তুমি মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাথিদের আশ্রয় দিয়েছো? হযরত সা'দ বলেন, হ্যাঁ। এরপর তারা উভয়ে পরস্পরকে গালমন্দ করে (অর্থাৎ আবু জাহল তাকে চ্যালেঞ্জ দেয় যে, তুমি কীভাবে তওয়াফ করতে পারো; তুমি তো মুহাম্মদ (সা.)-কে আশ্রয় দানকারীদের একজন। যাহোক তিনি বলেন, হ্যাঁ আমি আশ্রয়ও দিয়েছি আর আমি (কা'বা) তওয়াফও করব। তারা পরস্পর বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। উমাইয়্যা হযরত সা'দ (রা.)-কে বলে, হে সা'দ! আবুল হাকাম (এটি আবু জাহলের ডাকনাম ছিল) এর সামনে উচ্চস্বরে কথা বোলো না, কেননা সে এ উপত্যকাবাসীর নেতা। হযরত সা'দ বলেন, খোদার কসম! যদি তুমি বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করতে আমাকে বাধা দাও তাহলে আমি (তোমাদের জন্য) এর চেয়েও

কঠিন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করব। আর তা হলো, তোমাদের বাণিজ্যিক পথ, যা মদীনার পাশ ঘেঁষে অতিক্রম করে, অর্থাৎ সিরিয়াগামী বাণিজ্যিক পথ বন্ধ করে দেবো। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলতেন, উমাইয়্যা হযরত সা'দ (রা.)-কে একথাই বলতে থাকে যে, 'উচ্চস্বরে কথা বোলো না' এবং তাকে থামানোর চেষ্টা করতে থাকে। হযরত সা'দ (রা.) রাগান্বিত হয়ে উমাইয়্যাকে বলেন, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও এবং তার সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব কোরো না। অর্থাৎ আবু জাহলকে সমর্থন কোরো না, আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে শুনেছি, তিনি (সা.) বলতেন, তিনি তোমাকে হত্যা করবেন; অর্থাৎ তোমার নিহত হবার ভবিষদ্বাণী করেছেন। আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তারা অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথিরা তোমাকে হত্যা করবে। উমাইয়্যা জিজ্ঞেস করে, আমাকে? হযরত সা'দ (রা.) বলেন, হ্যাঁ ! তোমাকে। এরপর উমাইয়্যা তাকে জিজ্ঞেস করে, মক্কাতে? হযরত সা'দ বলেন, তা আমি জানি না। এ কথা শোনার পর উমাইয়্যা বলে, খোদার কসম! মুহাম্মদ (সা.) যখন কোনো কথা বলেন তখন তিনি মিথ্যা কথা বলেন না। এরপর সে তার স্ত্রীর কাছে ফিরে আসে এবং তাকে বলে, আমার "ইয়াসরেবী" ভাই আমাকে কি বলেছে, তুমি কি তা জানো? সে জিজ্ঞেস করে, কি বলেছে? উমাইয়্যা বলে, সে নাকি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছে যে, তিনি বলেছেন, তিনি আমাকে হত্যা করবেন। তার স্ত্রী বলে, আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদ (সা.) মিথ্যা কথা বলেন না। এটি সেই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যার কারণে উমাইয়্যা ভীতত্রস্ত ছিল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়া এড়াতে চাচ্ছিল। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলতেন, সে যখন বদর অভিমুখে যাত্রা করে এবং (কোনো) সাহায্যপ্রার্থী আসে, তখন উমাইয়্যার স্ত্রী তাকে বলে, তোমার কি সেকথা স্মরণ নেই যা তোমার মদীনাবাসী ভাই তোমাকে বলেছিল? তার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আবু জাহল তাকে বলে, তুমি এই উপত্যকার সর্দারদের একজন তাই এক-দুই দিনের জন্য হলেও (আমাদের) সাথে চলো। অতঃপর সে তাদের সাথে দুদিনের জন্য চলে যায় এবং আল্লাহ্ তা'লা তাকে নিহত করেন।

কোনো কোনো জীবনীকার এ কথাও উত্থাপন করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, তাকে তিনি হত্যা করবেন; অথচ তিনি (সা.) তাকে হত্যা করেন নি। এ সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারীগণ বলেন, এর অর্থ হলো তিনি (সা.) তার হত্যার কারণ হবেন। মহানবী (সা.) তো উমাইয়্যা বিন খালাফ-এর ভাই, উবাই বিন খালাফ ছাড়া অন্য কাউকে হত্যা করেননি। তাকে তিনি (সা.) উহুদের যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। ব্যাখ্যাকারীগণ আরো বলেন, হযরত সা'দ (রা.) উমাইয়্যাকে হয়ত কেবল একথাই বলে থাকবেন যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথিরা তোমাকে হত্যা করবে। কেননা যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে আর রেওয়ায়েতে এটিও আছে যে, তিনি কিংবা তাঁর (সা.) সাথিরা তাকে হত্যা করবেন। যাহোক, এ ব্যক্তি নিহত হয়েছে। এ বিতর্কের প্রয়োজন নেই যে, কে হত্যা করেছে। এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যা পূর্ণতা লাভ করেছে।

অনুরূপভাবে আবু লাহাবও যুদ্ধে যেতে ভীতত্রস্ত ছিল। সে নিজের স্থলে অন্য একজনকে পাঠিয়েছিল, স্বয়ং যুদ্ধে যায়নি। আতেকা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের স্বপ্নই ছিল তার যুদ্ধে না যাওয়ার (মূল) কারণ। সে বলতো, আতেকার স্বপ্ন হাত থেকে কোনো বস্তু গ্রহণ করার মতো বিষয় অর্থাৎ সুনিশ্চিত কথা।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে লিখেছেন যে, কেবল দু'জন ব্যক্তি ছিল যারা এ অভিযানে অংশগ্রহণ করতে ইতস্তত করেছিল। আর তারা ছিল আবু লাহাব ও উমাইয়্যা বিন খালাফ। তাদের এই দ্বিধা বা সংকোচ মুসলমানদের প্রতি

সহমর্মিতার কারণে ছিল না। বরং আবু লাহাব তার বোন আতেকা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের স্বপ্নকে ভয় পাচ্ছিলো, যা সে যমযম-এর (মক্কায়) আগমনের মাত্র তিন দিন পূর্বে কুরাইশের নিপাত হওয়া সম্পর্কে দেখেছিল। আর উমাইয়্যা বিন খালাফ তার মৃত্যু সংক্রান্ত মহানবী (সা.)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে ভীতত্রস্ত ছিল আর হযরত সা'দ বিন মুআযের মাধ্যমে সে (মক্কায়) এ সংবাদ পেয়েছিলো। কিন্তু যেহেতু এই দুজন প্রসিদ্ধ নেতা পিছিয়ে থাকলে সাধারণ কাফিরদের ওপর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা ছিল, এ কারণে অন্যান্য কুরাইশ নেতা আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করে ও উদ্বুদ্ধ করে এ দুজনকে (যুদ্ধে যেতে) সম্মত করায়। অর্থাৎ উমাইয়্যা নিজেই যেতে সম্মত হয়ে যায় আর আবু লাহাব যথেষ্ট অর্থ-কড়ি দিয়ে অন্য একজনকে নিজের স্থলে দাঁড় করিয়ে দেয়। এভাবে তিন দিনের প্রস্তুতির পর এক সহস্রাধিক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বাহিনী মক্কা থেকে যাত্রা করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এই সৈন্যদলের মক্কায় থাকতেই কতিপয় কুরাইশ নেতার মনে পড়ে, যেহেতু বনু কেনানা গোত্রের শাখা বনু বকরের সাথে মক্কাবাসীদের সম্পর্ক ভালো নয় তাই কোথাও এমন না হয় যে, তাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তারা তাদের অবর্তমানে মক্কায় আক্রমণ করে বসবে। আর এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু কুরাইশ দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। কিন্তু বনু কেনানার একজন সরদার সুরাকা বিন মালেক বিন জোশাম তাদেরকে আশ্বস্ত করে, যে তখন মক্কাতে অবস্থান করছিল। সে বলে, আমি এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, মক্কার ওপর কোনো আক্রমণ হবে না; বরং সুরাকা মুসলমানদের বিরোধিতায় এতটা উন্মাদ ছিল যে, কুরাইশদের সাহায্যার্থে সে নিজেও বদর পর্যন্ত যায়। কিন্তু সেখানে মুসলমানদেরকে দেখে তার ওপর এমন ভীতি বিরাজ করে যে, যুদ্ধের পূর্বেই সে নিজ সঙ্গীসাথিদের ফেলে পালিয়ে আসে।

মক্কা থেকে যাত্রার পূর্বে কুরাইশরা কা'বা শরীফে গিয়ে দোয়া করে যে, **হে খোদা! আমাদের উভয় দলের মাঝে যে দল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তোমার দৃষ্টিতে অধিক ভালো ও অধিক উত্তম তুমি তার সাহায্য করো আর অপর দলকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করো। এরপর কাফির সেনা বড় আড়ম্বর ও গর্বের সাথে মক্কা থেকে যাত্রা আরম্ভ করে।** (এভাবে) নিজ ধ্বংসের দোয়া তারা নিজেরাই করে নেয়।

এই তথ্যও রয়েছে যে, শুরুতে মক্কার সৈন্য সংখ্যা তেরশ ছিল। কিন্তু বনু যোহরা ও বনু আদীর সদস্যরা পথিমধ্যে এই সেনাদল থেকে পৃথক হয়ে যায়। এভাবে কুরাইশ সৈন্যদলের সংখ্যা সাড়ে নয়শ অথবা আরেকটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী এক হাজার অবশিষ্ট থাকে। তাদের কাছে **একশ' বা কতকের মতে দুইশ' ঘোড়া, সাতশ উট, ছয়শ বর্ম এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র যেমন বর্শা, তরবারি, তির-ধনুক** প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

কুরাইশ সরদারদের মৃত্যু সম্পর্কে জুহায়েম বিন সালত-এর একটি স্বপ্নের উল্লেখ পাওয়া যায়। কুরাইশ সদস্যরা মক্কা থেকে বের হয়ে জুহফা'তে অবতরণ করে। জুহফা মক্কা হতে মদীনার দিকে প্রায় ৮২ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। জুহায়েম বিন সালত লোকের কাছে বর্ণনা করে যে, আমি স্বপ্ন দেখেছি, এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চেপে আসে এবং তার কাছে একটি উটও আছে। আর সেই ব্যক্তি বলছে যে, উতবা বিন রাবিআ নিহত হয়েছে, শায়বা বিন রাবিআ নিহত হয়েছে, আবুল হাকাম বিন হিশাম অর্থাৎ আবু জাহল নিহত হয়েছে, উমাইয়্যা বিন খালাফ নিহত হয়েছে এবং অমুক অমুক অর্থাৎ কুরাইশ সরদারদের মধ্যে যারা পরবর্তীতে বদরে নিহত হয়েছে তাদের সবার নাম নেয়। এরপর আগন্তুক সেই ব্যক্তি নিজ উটের ঘাড়ে বর্শা ছুড়ে আঘাত করে আমাদের সেনাদলের দিকে ছেড়ে দেয়। এর ফলে আমাদের সেনাদলের এমন কোনো তাঁবু বাকি রইল না যাতে সেই উটের রক্ত লাগেনি। আবু জাহল

এই স্বপ্ন শুনে বিদ্রুপমেশানো ক্রোধের সাথে বলে, বনু মুত্তালিবে আরও একজন নবীর জন্ম হয়েছে! আগামীকাল আমরা যদি যুদ্ধ করি তাহলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কে নিহত হয়।

যাহোক, যেমনটি বলা হয়েছে; আবু সুফিয়ান পথ পরিবর্তন করে চলে গিয়েছিল। সে আবু জাহলকে বার্তা পাঠায়, যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই, ফিরে এসো। আর গতবারও যেমনটি বর্ণিত হয়েছিল যে, আবু সুফিয়ান স্বয়ং সাবধানতা অবলম্বন করত কাফেলা থেকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ঝরনার কাছে আসে আর সেখানে কোনো এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেসা করে যে, তুমি কি কাউকে আসা-যাওয়া করতে দেখেছো? সে উত্তর দেয়, আমি সন্দেহভাজন কোনো ব্যক্তিকে তো দেখিনি তবে দুজন যাত্রীকে দেখেছি যারা তাদের উট ঐ টিলার কাছে বসিয়েছিল আর মশকে পানি ভর্তি করে চলে যায়। আবু সুফিয়ান তাদের উট বসানোর স্থানে আসে এবং তাদের উটের গোবর উঠিয়ে ভাঙলে তাতে খেজুরের আঁটি পায়। এটি দেখে সে বলে উঠে, খোদার কসম এটি মদীনার পশুখাদ্য। সে দ্রুত নিজ সাথিদের কাছে ফিরে আসে এবং তাদের উটগুলোর মুখে আঘাত করে সেগুলোর যাত্রাপথ পরিবর্তন করে নেয় এবং সমুদ্রউপকূল অভিমুখে বেরিয়ে যায় আর বদরকে তার ডান পার্শ্বে রেখে দ্রুততার সাথে চম্পট দেয়। এটি গত খুতবায়ও আমি বর্ণনা করেছি। যাহোক, তার কাফেলার নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর আবু সুফিয়ান কুরাইশদের এই মর্মে সংবাদ প্রেরণ করে যে, তোমরা কেবল নিজ কাফেলা, লোকজন এবং সম্পদ বাঁচাতে বেরিয়েছিলে, আল্লাহ্ তা'লা তা রক্ষা করেছেন, তাই তোমরা ফিরে আসো। কিন্তু আবু সুফিয়ানের এই বার্তা শুনে আবু জাহল বলে, খোদার কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বদরে না পৌঁছাবো ততক্ষণ আমরা কোনো ক্রমেই ফিরে যাবো না। আরবের মেলার স্থানসমূহের মাঝে অন্যতম একটি ছিল বদর, যেখানে প্রতিবছর তাদের বাজার বসতো। সে বলল, আমরা সেখানে তিন দিন অবস্থান করব, উট জবাই করব, খাওয়াদাওয়া করাব, মদ পান করাবো। আমাদের দাসীরা আমাদের সামনে সংগীত পরিবেশন করবে। সমগ্র আরব আমাদের সম্পর্কে, আমাদের অভিযান ও আমাদের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে শুনবে আর তারা সবসময় আমাদের ভয়ে ভীত থাকবে। তাই এগিয়ে চলো। ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে সে (অর্থাৎ আবু জাহল) বলল, যেকোনো মূল্যে সেখানে আমাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে যেতেই হবে। তার সাথে বনু যোহরা গোত্রও ছিল। এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, তারাও ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আবু সুফিয়ানের সংবাদ শোনার পর বনু যোহরা গোত্রের মিত্র আখনাস বিন শরীক বলে, হে বনু যোহরা! আল্লাহ্ তোমাদের সম্পদও নিরাপদ রেখেছেন এবং তোমাদের বন্ধু মাখযামা বিন নওফেলকেও মুক্তি দিয়েছেন। সে আবু সুফিয়ানের কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তোমরা মাখযামাকে বাঁচানো এবং নিজেদের সম্পদের সুরক্ষার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছিলে। কাপুরুষতার অপবাদ তোমরা আমার প্রতি আরোপ কোরো। মানুষ তো এটাই বলবে যে, তোমরা কাপুরুষ তাই যুদ্ধ থেকে পালাচ্ছ। তাই সে বলে যে, অপবাদ আমার প্রতি আরোপ কোরো আর ফিরে চলো, কেননা ক্ষয়ক্ষতি না হলে তোমাদের বের হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আবু জাহলের কথায় কান দিও না। অতএব তারা ফিরে যায় এবং বনু যোহরা গোত্রের কেউ যুদ্ধে অংশ নেয়নি। একইভাবে বনু আদী বিন কা'ব থেকেও কোনো সদস্য যুদ্ধে অংশ নিতে যায়নি এবং সবাই ফেরত চলে যায়। কুরাইশদের সৈন্যবাহিনী সামনে অগ্রসর হতে থাকে। হযরত আবু তালেবের পুত্র তালেব-ও এই সৈন্যবাহিনীতে ছিল। কুরাইশের কিছু লোকের সাথে তার কথা হয়। কুরাইশরা তাকে খোঁটা দিয়ে বলে যে, হে বনি হাশেম! খোদার কসম, আমরা জানি, যদিও তোমরা আমাদের সাথে এসেছো কিন্তু তোমাদের আন্তরিক সহানুভূতি মুহাম্মদ (সা.) এর সাথেই রয়েছে। একথা শুনে তালেব তার কয়েকজন

বন্ধুর সাথে মক্কায় ফেরত চলে যায়। এক রেওয়ায়েতে এই কথাও উল্লিখিত দেখা যায় যে, তালেব বিন আবু তালেব বাধ্য হয়ে মুশরিকদের সাথে বদরে গিয়েছিল। কিন্তু বন্দিদের মাঝেও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি আর নিহতদের মাঝেও না আর সে নিজের বাড়িও ফিরে আসেনি। এটি তাবারীর উদ্ধৃতি। যাহোক, অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী, যা তেরোশ থেকে হ্রাস পেয়ে প্রায় এক হাজার রয়ে গিয়েছিল, তারা নিজেদের যাত্রা অব্যাহত রাখে এবং বদরের কাছে একটি টিলার পিছনে গিয়ে নিজেদের তাঁবু খাটায়।

মহানবী (সা.)-এর মদীনা থেকে যাত্রা এবং মুসলমান সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা সম্পর্কে লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) দ্বিতীয় হিজরী সনের বারো রমযান রোজ শনিবার মদীনা থেকে যাত্রা করেন। তাঁর (সা.) সাথে তিনশ'র কিছু বেশি লোক ছিল যাদের মধ্যে চুয়াত্তর জন মুহাজির এবং অন্যরা ছিল আনসার। এটি প্রথম যুদ্ধ ছিল যেখানে আনসাররাও অংশ নিয়েছিল। হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-কে মহানবী (সা.) মদীনাতেই অবস্থান করার নির্দেশ দেন কেননা তাঁর (রা.) সহধর্মিণী হযরত রুকাইয়্যা বিনতে রসূল (সা.) অসুস্থ ছিলেন। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উসমান নিজেই অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু বেশি প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত এটিই যে, তাঁর মোহতরমা স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন। অধিকাংশ রেওয়ায়েতে মুসলমানদের সংখ্যা ৩১৩ বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত বারা' বিন আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যেসব সাহাবী বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তারা আমাকে বলেছেন, তাদের সংখ্যা ঠিক ততজন ছিলেন যতজন তালূতের সাথে তার সঙ্গী হিসেবে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল, অর্থাৎ ৩১০ থেকে কয়েকজন বেশি। হযরত বারা' বলতেন, খোদার কসম, তালূতের সাথে কেবল মু'মিনরাই সমুদ্র পার করেছিল। একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী (সা.) সাহাবী (রা.)-কে গণনার নির্দেশ দেন। গণনার পর মহানবী (সা.)-কে তারা সংবাদ দেন যে, (আমাদের লোকসংখ্যা) ৩১৩জন। (একথা শুনে) তিনি (সা.) খুবই আনন্দিত হন আর বলেন, তালূতের সঙ্গীদের সমান।

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা দেখতে পাই, বদরের উদ্দেশ্যে বের হওয়া সাহাবীদের সংখ্যা ছিল ৩১৩জন। তারা যদি ৩১৩-এর পরিবর্তে ৬০০ বা ৭০০ সংখ্যায় বের হতেন আর যেসব সাহাবী মদীনায় অবস্থান করছিলেন তারাও তাদের সাথে যোগ দিতেন তাহলে তাদের জন্য যুদ্ধ অনেক সহজ হয়ে যেত। কিন্তু এ যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ (সা.)-কে অবহিত করেছিলেন আর একই সাথে নিষেধ করে বলেন, যুদ্ধের কথা কাউকে না বলতে। আর এর কারণ ছিল, আল্লাহ্ তা'লা অতীতের কিছু ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। যেমন সাহাবীদের সংখ্যা ৩১৩জন ছিল এবং বাইবেলে এ ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান ছিল যে, গিদিয়নের সাথে যা ঘটেছিল সেই একই ঘটনা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের সাথেও ঘটবে। নবী গিদিয়ন যখন তাঁর শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন তাঁর দলে লোকসংখ্যা ছিল ৩১৩জন। তাই যদি সাহাবীরা জেনে যেতেন যে, আমরা যুদ্ধের জন্য মদীনা থেকে বের হচ্ছি তাহলে তারা সবাই বের হয়ে আসতেন এবং তাদের সংখ্যা ৩১৩ হতে বেশি হয়ে যেতো। এ প্রজ্ঞার অধীনেই আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন যেন সাহাবীদের (রা.) সংখ্যা ৩১৩ অতিক্রম না করে। কেননা ৩১৩জন সাহাবীর যাত্রা করাই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে পারত, তাই যুদ্ধের সংবাদ গোপন রাখা আবশ্যক ছিল। কাজেই যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছানোর পর সাহাবীদের জানানো হয় যে, তোমাদের মোকাবিলা হবে কুরাইশ বাহিনীর সাথে।

উম্মে ওয়ারাকা বিনতে নওফেল নামে একজন মহিলা ছিলেন। জিহাদে যোগ দেয়া সম্পর্কে তাঁর আবেগ ও উচ্ছ্বাস সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে, মহানবী (সা.) যখন বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিলেন তখন হযরত উম্মে ওয়ারাকা তাঁর কাছে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকেও জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দিন, আমি আপনার সাথে অসুস্থদের সেবাশুশ্রূষা করব। হতে পারে আল্লাহ্ আমাকেও শাহাদত বরণের সৌভাগ্য দান করবেন। উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, তুমি তোমার ঘরেই থাকো আর আল্লাহ্ তোমাকে শাহাদত বরণের সৌভাগ্য দান করবেন। সেই মহিলা সাহাবীর পবিত্র কুরআন পড়া ছিল আর মহানবী (সা.) তার বাড়িতে যাতায়াত করতেন এবং তিনি (সা.) তার নাম রেখেছিলেন, **শহীদা**। তাই সাধারণ মুসলমানরাও তাকে শহীদা নামেই ডাকত। পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে হযরত উম্মে ওয়ারাকা (রা.)'র এক দাস ও দাসী তাকে চাদর দিয়ে চেপে ধরে অজ্ঞান করে ফেলে আর এভাবে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। এই দাস ও দাসী সম্পর্কে তিনি (রা.) ওসীয়্যত করে রেখেছিলেন যে, আমার মৃত্যুর পর তারা মুক্ত হয়ে যাবে। হযরত উমর (রা.)'র নির্দেশে হত্যাকারীদের ফাঁসি দেওয়া হয়। হযরত উমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) সত্য বলেছিলেন। তিনি (সা.) বলতেন, আমার সাথে চলো শহীদা'র সাথে সাক্ষাৎ করে আসি। তার ঘরে যাওয়ার সময় তিনি (সা.) হযরত উমর (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীকেও সাথে নিয়ে যেতেন।

একটি রেওয়ায়েতে মুসলিম সেনাবাহিনীর শক্তিসামর্থ্যের বিবরণ নিম্নরূপ লেখা হয়েছে। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই যুদ্ধে মুসলমানদের পাঁচটি ঘোড়া ছিল। কারো কারো মতে মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল, একটি হযরত মিকদাদ (রা.)'র ঘোড়া এবং আরেকটি ছিল হযরত যুবায়ের (রা.)'র। হযরত আলী (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, বদরের দিন হযরত মিকদাদ (রা.) ছাড়া আর কোনো অশ্বারোহী ছিলেন না। তাই রেওয়ায়েতে ঘোড়ার সর্বোচ্চ যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা হলো পাঁচ। **মুসলমানদের কাছে ৭টি বর্ম ছিল এবং উটের সংখ্যা ছিল ৭০ বা ৮০টি** যাতে তারা সবাই পালাক্রমে আরোহন করতেন। মহানবী (সা.), হযরত আলী (রা.) এবং হযরত মারসাদ বিন আবু মারসাদ (রা.) একটি উটে পালাক্রমে আরোহণ করতেন। মহানবী (সা.)-এর পায়ে হাঁটার পালা এলে তাঁর অন্য দুজন সাথি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার পালায় আমরা পায়ে হেঁটে যাব আপনি বাহনেই থাকুন। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী নও আর পুণ্য ও প্রতিদানের বিষয়ে আমি তোমাদের চেয়ে ভ্রূক্ষেপহীন নই। অর্থাৎ আমিও এ যুদ্ধের এ অভিযানের সওয়াব পেতে চাই। সাহাবীদের সপক্ষে মহানবী (সা.)-এর একটি দোয়া ছিল, সে সম্পর্কে লেখা আছে যে, পথিমধ্যে একটি স্থান অতিক্রম করার সময় মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদের জন্য দোয়া করেন যে, **হে আল্লাহ্! এরা খালি পায়ে আছে, এদেরকে তুমি বাহন দান করো। এরা বিবস্ত্র, এদেরকে তুমি পোশাক দান করো। এরা ক্ষুধার্ত, এদেরকে তুমি পরিতৃপ্ত করো। এরা রিক্তহস্ত, এদেরকে তুমি স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদশালী করো**। অতএব এ দোয়া গৃহীত হয় আর বদরের যুদ্ধ থেকে ফেরত আসা লোকদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে বাহনে যেতে চেয়েছে আর ব্যবহার করার জন্য সে একটি বা দুটি উট পায়নি। একইভাবে যাদের কাছে কাপড় ছিল না তারা কাপড় পেয়ে যায় আর তারা এতটা রসদ লাভ করে যে, পানাহার দ্রব্যের কোনো ঘাটতি ছিল না। অনুরূপভাবে যুদ্ধবন্দিদের মুক্তিপণস্বরূপ এত বেশি পরিমাণ বিনিময় আসে যে, প্রতিটি পরিবার সম্পদশালী হয়ে যায়।

কিছু মানুষ মদীনায় অবস্থান করে এবং কিছু সংখ্যক অল্প বয়স্ক যোদ্ধাকে মহানবী (সা.) ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। এ সম্পর্কে লেখা আছে, বদরের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার ঘোষণা যদিও গণ ঘোষণা ছিল কিন্তু এর জন্য খুব বেশি প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়নি। যেমন, রেওয়ায়েত রয়েছে– কিছু মানুষ নিবেদন করে যে, মদীনা থেকে কিছুটা দূরে আমাদের বাহন রাখা আছে, আমরা সেগুলো নিয়ে আসি। (কিন্তু তাদেরকে) বলা হয়, না (আনা যাবে না)। ফলে এসব লোককে (মদীনাতেই) থাকতে দেয়া হয় অথবা তারা কোনো বাহন ছাড়াই যাত্রা করে। এখানে যেটি লেখা রয়েছে তা হলো, এটি সাধারণ ঘোষণা ছিল। এটি সার্বজনীন (নির্দেশ) ছিল ঠিকই কিন্তু তথাপি বিধিনিষেধ ছিল। আর মহানবী (সা.) কাউকে প্রস্তুতির খুব একটা সুযোগও দেননি যেন বেশি লোক যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিতে না পারে। যাহোক, লেখা আছে যে, এভাবে কিছু নিষ্ঠাবান মানুষ এমন ছিলেন যারা কোনো না কোনো কারণে পেছনে রয়ে যাওয়ার অনুমতি পান। যেমন, হযরত উসমান (রা.)'র কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে আবু উমামা বিন সা'লবা (রা.)'র মা অসুস্থ ছিলেন তবুও তিনি যুদ্ধের বিষয়ে সংকল্পবদ্ধ হন, কিন্তু মহানবী (সা.) নির্দেশ দেন, তিনি যেন তার অসুস্থ মায়ের কাছে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) বদর থেকে ফিরে আসার পূর্বেই তাঁর মা ইন্তেকাল করেন। মহানবী (সা.) তার কবরে গিয়ে দোয়া করেন। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.), যিনি অত্যন্ত আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সাথে লোকদেরকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করছিলেন তাকে সাপে দংশন করে, ফলে তিনি মদীনায় রয়ে যান। অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) পথিমধ্যে একটি স্থানে যাত্রাবিরতি দিয়ে অল্পবয়স্ক যোদ্ধাদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তাদের মধ্যে একজন উমায়ের বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)ও ছিলেন। কিশোরদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ শোনার পর তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন। ফলে মহানবী (সা.) তাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেন। তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং শাহাদত বরণ করেন। যেসব অল্প বয়স্ক যোদ্ধাকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল তাদের মাঝে **উসামা বিন যায়েদ, রাফে বিন খাদিজ, বারা' বিন আযেব, উসায়েদ বিন যুহায়ের, যায়েদ বিন আরকাম এবং যায়েদ বিন সাবেত (রা.)ও** অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

বর্তমানে এমন যুগ এসেছে যখন মানুষ ইসলাম এবং ঈমানের খাতিরে কুরবানী করা থেকে বাঁচার জন্য অজুহাত খুঁজে বেড়ায় আর সময় এলে বলে, আমাদের এই সমস্যা ও সেই প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাবে মুসলমানদের মাঝে কুরবানীর এমন স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে পুরুষ এবং সাবালিকা মহিলাদের কথা তো বাদই দিলাম, কিশোররাও এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিল, এমনকি বদরের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) সাহাবীদের ডাকেন যাতে তাদের মাঝ থেকে তাদেরকে তিনি (সা.) নির্বাচন করতে পারেন যারা যুদ্ধ করার যোগ্য। তখন এক কিশোর ছেলে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে (তিনি নিজেও এবং অন্য সাহাবীরাও বর্ণনা করেন যে,) যখন সাহাবীরা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান তখন সে-ও ইসলামের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার সুযোগ লাভ করার কথা ভেবে লাইনে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু অন্যদের তুলনায় তার উচ্চতা কম হওয়ার দরুন অন্যদের চেয়ে ছোট মনে হতো। তার ভয় হচ্ছিল, সে না আবার বাদ পড়ে যায়, তাই সে পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে গোড়ালি উঁচু করে দাঁড়ায় যাতে বড় দেখায়। একই সাথে নিজের বুক টান করে দাঁড়ায় যাতে দুর্বল মনে না হয়। মহানবী (সা.) বলেন, ১৫ বছরের কম বয়সী কোনো ছেলেকে যেন না নেয়া হয়। বাছাই করতে করতে তিনি (সা.) যখন সেই ছেলের কাছে পৌঁছান তখন তাকে দেখে বলেন, এ তো বালক! একে কে দাঁড় করিয়েছে?

একে সরিয়ে দাও। (এই ঘটনা যদি বর্তমান যুগে ঘটতো তাহলে হয়তো এমন ছেলে এই ভেবে আনন্দে লাফাতো যে, 'আমি বেঁচে গেছি'।) কিন্তু সেই ছেলেকে যখন লাইন থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল তখন সে এতো কাঁদে, এতো কাঁদে যে, তার কান্না দেখে মহানবী (সা.)-এর মায়া লাগে আর তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে তাকে নিয়ে নেয়া হোক।

এই সফরের সময় মহানবী (সা.) যাকে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন সে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মদীনা থেকে যাত্রা করার সময় তিনি (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি (সা.) রওহা নামক স্থানের কাছাকাছি পৌঁছেন যা মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত তখন সম্ভবত এই চিন্তা করে যে, আব্দুল্লাহ্ একজন অন্ধ মানুষ আর কুরাইশ বাহিনীর একান্ত কাছে এসে যাওয়া সংক্রান্ত সংবাদের দাবি হলো, মহানবী (সা.)-এর অবর্তমানে মদীনায় ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় থাকা। তাই তিনি (সা.) আবু লুবাবা বিন মুনযের (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে মদীনায় ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম সম্পর্কে নির্দেশ দেন, তিনি কেবল ইমামুস্ সালাত থাকবেন কিন্তু প্রসাশনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন আবু লুবাবা (রা.)। মদীনার উঁচু অংশ অর্থাৎ কুবার জন্য তিনি (সা.) হযরত আসেম বিন আদী (রা.)-কে পৃথক আমীর নিযুক্ত করেন।

ইসলামী সেনাবাহীনির পতাকা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) ইসলামী সেনাবাহিনীর পতাকা বহনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-কে। এটি ছিল সাদা রংয়ের পতাকা। এটি ছাড়াও দুটি কালো রংয়ের পতাকা ছিল যার একটি ছিল হযরত আলী (রা.)'র নিকটে যার নাম ছিল উকাব আর সেটি হযরত আয়েশা (রা.)'র ওড়না দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছিল। অন্য পতাকাটি ছিল একজন আনসারী সাহাবীর কাছে।

এক বর্ণনা অনুযায়ী মুসলিম সেনাবাহিনীর নিকট তিনটি পতাকা ছিল। মুহাজিরদের পতাকা ছিল হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র নিকট, খাযরাজ গোত্রের পতাকা ছিল হযরত হুবাব বিন মুনযের (রা.)'র নিকট এবং অওস গোত্রের পতাকা ছিল হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)'র নিকট। হযরত খওয়াত বিন জুবায়েরও যুদ্ধের এই সফরে সাথে ছিলেন কিন্তু পথে একস্থানে তার পায়ে একটি পাথরের আঘাত লাগার কারণে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত শুরু হয়। সেকারণে তার হাঁটার সামর্থ্য ছিল না তাই তিনি মদীনায় ফেরত যান। মহানবী (সা.) তার জন্যও গনিমতের মালে একটি অংশ রেখেছিলেন। কোনো কোনো আলেমের মতে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন কিন্তু সঠিক রেওয়ায়েত হলো, তিনি ফেরত চলে এসেছিলেন।

মুশরিকদের সাহায্য নিতে অস্বীকার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মদীনায় হাবীব বিন ইয়াসাফ নামের একজন অত্যন্ত শক্তিশালী ও সাহসী ব্যক্তি ছিল, সে খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিল। সে বদরের যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান হয় নি কিন্তু সে-ও তার জাতি খাযরাজ গোত্রের সাথে যুদ্ধের জন্য বের হয় আর যুদ্ধ জয়ের পর তার গনিমতের সম্পদ লাভেরও আশা ছিল। তাকে সাথে পেয়ে মুসলমানরাও অনেক আনন্দিত হয়েছিল, কেননা সেও তাদের সাথে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে। কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে বলেন, আমাদের সাথে সে–ই যুদ্ধে যেতে পারবে যে আমাদের ধর্মের অনুসারী। একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে– তিনি বলেছেন, তুমি ফিরে যাও; আমরা মুশরিকদের সাহায্য নিতে চাই না। হাবীব বিন ইয়াসাফ দ্বিতীয়বার পুনরায় মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে কিন্তু মহানবী (সা.) দ্বিতীবারও তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। অবশেষে তৃতীয়বার সে যখন আসে তখন তিনি (সা.) তাকে বলেন, তুমি কি আল্লাহ্ ও তাঁর

রসূলের প্রতি ঈমান আনছ? সে বলে, হ্যাঁ; একথা বলে সে মুসলমান হয়ে যায় আর অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে।

এই সফরে হযরত সা'দের হরিণ শিকার করারও উল্লেখ পাওয়া যায়। পথিমধ্যে এক জায়গায় পৌঁছে মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-কে বলেন, হে সা'দ! হরিণকে দেখো আর তির নিক্ষেপ করো। তিনি রাস্তায় হরিণ দেখতে পান, মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে আপন পবিত্র চিবুক হযরত সা'দের উভয় বাহু এবং কানের মাঝে রাখেন এবং বলেন, তির নিক্ষেপ করো; (আর দোয়া করেন) হে আল্লাহ্! সা'দের লক্ষ্য নির্ভুল করে দাও। এরপর তিনি তির নিক্ষেপ করেন, তার তির হরিণ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। তখন মহানবী (সা.) মুচকি হাসেন আর হযরত সা'দ (রা.) দৌড়ে গিয়ে সেই হরিণকে ধরেন। তিনি দেখেন, এখনো এর মাঝে প্রাণের স্পন্দন অবশিষ্ট আছে। অতঃপর তিনি এটিকে জবাই করে তুলে নিয়ে আসেন। এরপর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশক্রমে সাহাবীদের মাঝে এটি বণ্টন করে দেয়া হয়। মহানবী (সা.) যাত্রা অব্যাহত রাখেন; যখন সাফরা নামক স্থানে পৌঁছেন যা সবুজ শ্যামল এবং খেজুর গাছে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা ছিল। এটি বদর প্রান্তর থেকে এক মঞ্জিল দূরত্বে অবস্থিত। যাহোক, মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে দুজনকে বদর অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং নিজেও সৈন্য সামন্ত নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। এভাবে জাফেরান নামক উপত্যকা অতিক্রম করে এক জায়গায় শিবির স্থাপন করেন। এটি সাফরা উপত্যকার পার্শ্ববর্তী একটি উপত্যকা। যে দুজনকে আবু সুফিয়ান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য মহানবী (সা.) পাঠিয়েছিলেন তারা যেতে যেতে একেবারে বদরের প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে ঝরনার নিকটে এক টিলার পাশে উট বসিয়ে রেখে পানির মশক নিয়ে তাতে পানি ভরতে থাকেন। তারা সেখানে দুজন নারীর কণ্ঠ শুনতে পান, যারা একে অপরের হাত ধরে পানি নিতে আসছিল। তাদের একজন অপরজনকে বলছিল, কাল বা পরশু কাফেলা আসবে আমি তাদের কাজ করে পারিশ্রমিক পেলে তোমার ঋণ শোধ করে দিব। এই মেয়েরা ছাড়া আরো একজন লোক সেখানে উপস্থিত ছিল, সেই ব্যক্তি বলে, তুমি সত্য বলছ। মহানবী (সা.) প্রেরিত লোকেরা একথা শুনে ফেলেন আর উভয়ে তাদের উটে চড়ে ফিরে এসে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে যা শুনেছিল তা অবগত করেন। তারা বলে, এক সৈন্যবাহিনী আসছে। মহানবী (সা.)-এর কাছে যখন এ বার্তা এসে পৌঁছে তখন তিনি (সা.) আরো সতর্ক হয়ে যান। অবশিষ্ট বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে তুলে ধরা হবে।

এখন আমি কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করতে চাই। এদের মধ্যে একটি হলো হাযের জানাযা। এটি যুক্তরাজ্য নিবাসী মুকাররম শেখ গোলাম রহমানী সাহেবের। সম্প্রতি ৯২ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি অমৃতসর নিবাসী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত শেখ গোলাম জিলানী সাহেবের পুত্র এবং মুকাররম শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের জামাতা ছিলেন। শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব দীর্ঘদিন করাচী জামাতে কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন, অনেকদিন করাচী জামাতের আমীরও ছিলেন। শেখ গোলাম রহমানী সাহেবের পিতা ১৯০২ সালে কাদিয়ান সফর করেছিলেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দর্শন লাভ করেন এবং **এ চেহারা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না**– একথা বলে তৎক্ষণাৎ বয়আত করে নেন।

গোলাম রহমানী সাহেব ১৯৫৮ সালে যুক্তরাজ্যে এসে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (তড়িৎ প্রকৌশল) বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি এখানে দীর্ঘকাল যাবৎ হাসপাতালে মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলে কাজ করেন। বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী এবং ১০ বছরেরও অধিক কাল সাউথ হল জামাতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবাদানের তৌফিক লাভ করেন। স্থানীয় কাউন্সিল থেকে সাউথ হল মিশনের মঞ্জুরীর জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা করেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করেছেন। একটি বাড়িতে মিশন হাউজ প্রতিষ্ঠা করা হলে একজন প্রতিবেশী স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করে। প্রশাসন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে তা বন্ধ করে দিতে চায় কিন্তু রহমানী সাহেব অনেক চেষ্টা করে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁর অবস্থান প্রশাসনের নিকট উপস্থাপন করেন যার ফলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সফলতা লাভ হয় এবং জামাতের স্বপক্ষে রায় আসে। রহমানী সাহেব বছরের পর বছর সাউথ হল মিশন হাউজে রবিবারের ক্লাসের আয়োজন করেছেন এবং নতুন প্রজন্মের অনেককেই তার মাধ্যমে ইসলাম আহমদীয়াতের শিক্ষায় আলোকিত করেছেন। ১৯৯৬ সালে তিনি ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসায়া হিসেবে নিযুক্ত হন আর ২০০৫ সালে আমি যখন ওসীয়্যত সম্পর্কে তাহরীক করেছিলাম যে, চাঁদা প্রদানকারীদের শতকরা ৫০ ভাগ সদস্য মূসী হওয়া চাই, তখন তিনি নিরলস চেষ্টা করেন আর (মানুষকে) উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। তিনি ওসীয়্যত বিভাগকে কম্পিউটারাইজড্ও করেন এবং নিয়মতান্ত্রিক করেন। মরহুম নামায-রোযা ও কুরআন পাঠে নিয়মিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সদালাপি, স্থিতধী, মিতভাষী, সৌহার্দ্য বজায় রেখে সাক্ষাৎ করতেন, একজন পুণ্যবান সহানুভূতিশীল ও নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। খিলাফতের প্রতি প্রাণঢালা ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তিনি হজ্জব্রত পালনেরও সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুম মূসী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী জামিলা রহমানী ছাড়া এক পুত্র খালেদ রহমানী এবং এক কন্যা আয়েশাকে রেখে যান। তিনি আল্ ইসলাম ওয়েবসাইটের চেয়ারম্যান ডাক্তার নাসীম রহমতুল্লাহ্ সাহেবের ভগ্নিপতী ছিলেন। মুরুব্বী সিলসিলাহ্ লায়েক তাহের সাহেব লিখেন, (মরহুম) প্রতি মাসে মসজিদে ফযলে আসতেন এবং বড় অঙ্কের চাঁদা প্রদান করে রশীদ নিয়ে যেতেন। সেযুগে তাঁর সাথে আমার এতটুকুই জানাশোনা ছিল কিন্তু তাঁর পুণ্যের একটি গভীর প্রভাব ছিল আমার হৃদয়ে। বিস্তারিত পরিচয় ১৯৯০ সালে হয়েছিল যখন এখানে মুরুব্বী হিসেবে তার সাউথ হলে পদায়ন হয়। তিনি বলেন, তিনি ছিলেন সাউথ হলের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট। নিজের বাড়ির মতো মিশন হাউজের দেখাশোনা করতেন। অধিকাংশ সময় মিশন হাউজে অবস্থান করতেন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেন। মিশন হাউজ সম্প্রসারণের কাজও তাঁর যুগেই হয়েছে। তিনি ছিলেন নিপাট ভদ্রলোক, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবার সাথে স্নেহ, ভালোবাসা ও প্রবীণসুলভ হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতেন। জামাতের অর্থ সুরক্ষা করতেন এবং অত্যন্ত নিঃস্বার্থ বৈশিষ্ট্যের মানুষ ছিলেন। সত্যিই তার মাঝে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলী ছিল এছাড়া তার মাঝে আমিও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি। অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন এবং খিলাফতের সাথে তাঁর পরম বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। এক্ষেত্রে তিনি অনেক অগ্রগামী ছিলেন। এমন মানুষ দুর্লভ। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন। তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন আর তার সন্তান-সন্ততিকেও তার সৎকর্ম বজায় রাখার এবং তা ধারণ করার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয়টি গায়েবানা জানাযা। পূর্ববর্তী জানাযাটি ছিল হাযের; জুমু'আর নামাযের পর রহমানী সাহেবের জানাযা আদায় করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। প্রথম গায়েবানা জানাযাটি হলো– বুর্কিনা ফাসোর ডোরির মেহেদীয়াবাদ নিবাসী তাহের আগ মুহাম্মদ সাহেবের। সম্প্রতি ৪৪

বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন, তার পিতা ১৯৯৯ সালে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন কিন্তু তিনি বয়আত করেন নি। ১৯ বছর বয়সে পায়ের কষ্টের চিকিৎসার্থে ওয়াগাডুগু যান। অসুস্থ অবস্থায় অনেক দোয়া করেন– আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সহজ-সরল পথ প্রদর্শন করো। আহমদীয়াত যদি সত্য হয় তাহলে আমাকে পথ প্রদর্শন করো। যৌবনেই তার ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দোয়াও করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিভিন্ন স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি (আহমদীয়াতের সত্যতার বিষয়ে) নিশ্চিত হন এবং ফিরে এসে বয়আত গ্রহণ করেন। এরপর তিনি জামা'তের সেলাই সেন্টারে দর্জির কাজ শেখেন আর এটিকেই তিনি নিজের জীবন-জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম বানিয়ে নেন। এবারের ঈদুল ফিতরে যারা বুর্কিনা ফাসোর শহীদ ছিলেন তাদের পরিবারের সদস্যদের কাপড় সেলাই করার ছিল। অন্য কোনো দর্জি তাদের কাজ নেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সেখানকার মুরব্বী রানা ফারুক সাহেব তার কাছে গিয়ে এ কাজ করবেন কিনা জানতে চান। তখন তিনি সম্মত হয়ে যান। স্বামী-স্ত্রী দিন-রাত কাজ করে ঈদের পূর্বেই সত্তর জনের কাপড় সেলাই করে পাঠিয়ে দেন। মুহাম্মদ সাহেব তবলীগের গভীর আগ্রহ রাখতেন। খুবই শালীনভাবে কথা বলতেন। যদিও তিনি স্বল্পশিক্ষিত ছিলেন অথবা বলা চলে নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু খুব ভালো ফ্রেঞ্চ বলতে পারতেন। ক্যান্সারের কারণে তার পা হাঁটুর ওপর থেকে কেটে ফেলা হয়েছিল। কিছুদিন পূর্বে পুনরায় ঠিক সেখানেই রোগের আক্রমন হয় এবং ফুলে যায় যেখান থেকে পা কেটে ফেলা হয়েছিল। দেশের পরিস্থিতি যেহেতু প্রতিকূল, পথ-ঘাট সব বন্ধ তাই ওয়াগাডুগুর বড় হাসপাতালে যেতে পারেন নি, যেকারণে স্থানীয় হাসপাতালে থেকে যান। সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পর থেকেই তিনি তবলীগের গভীর আগ্রহ রাখতেন। সবসময় (তবলীগের) কোনো না কোন পথ খুঁজে বের করতেন। তিনি স্মার্ট ফোন কিনেছিলেন এবং নিজেদের ইমাম আলহাজ ইব্রাহীম বারদ্গা সাহেবকে বলেন, এতে তবলীগি (আলোচনা) রেকর্ড করে মানুষের কাছে পয়গাম পাঠান আর এভাবেই তিনি তবলীগ করতেন এবং এতে যা ব্যয় হতো তা নিজেই বহন করতেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি দু'জন স্ত্রী এবং পাঁচজন ছেলে-মেয়ে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দিন এবং মরহুমের পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দিন আর মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

অপর জানাযা খাজা দাউদ আহমদ সাহেবের। তিনি ২৫ মে, ২০২৩ তারিখে ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার এক সন্তান খাজা ফাহাদ আহমদ সাহেব কিরিবাসে জামাতের মুরব্বী হিসেবে (দায়িত্বরত) আছেন। তিনি বলেন, আমাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় আমার দাদা খাজা আব্দুল লাতিফ সাহেবের মাধ্যমে যিনি খাজা আহমদ দ্বীন সাহেবের পুত্র ছিলেন। দাদাজান লালিত-পালিত হন তার নানা খাজা গোলাম মোহাম্মদ সাহেবের গৃহে, যিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদী ছিলেন। তিনি বলেন, আমার দাদাজান তার গৃহে লালিত-পালিত হওয়া অবস্থায় ১৯১৭ সালে প্রায় এগারো বছর বয়সে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তভুক্ত হন আর নিজের সকল ভাইবোনের মাঝে তিনি একাই আহমদী ছিলেন। কানাডায় তার দীর্ঘদিন জামা'তের কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। প্রথমে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে তাঁর দীর্ঘদিন কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। ১৯৭৪ সালে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ইসলামাবাদ-এর কায়েদ হিসেবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস

(রাহে.)'র পাকিস্তান জাতীয় সংসদে আগমনে তিনি দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাঁর এই সেবার বিষয়ে সন্তুষ্টিও প্রকাশ করেছিলেন। পেশাগতভাবে তিনি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা এবং সুসম্পর্ক রাখতেন। উত্তমরূপে জামা'তের কাজ করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকতেন। মৃত্যুর সময় স্থানীয় সেন্টারেই ছিলেন, জামা'তের মজলিসে আমেলার মিটিং-এ ছিলেন। বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রার কিছু পূর্বে বুকে কিছুটা ব্যাথা অনুভব করেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিজ প্রভুর সকাশে গিয়ে উপস্থিত হন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে সহধর্মিনী ছাড়াও তার চার পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে। আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, তাঁর এক পুত্র ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী অর্থাৎ মুরব্বী সিলসিলাহ্, কিরিবাসের মুবাল্লিগ আর সেখানে জলসার ব্যস্ততা এবং জামা'তী কাজের ব্যস্ততার জন্য কানাডায় আসতে পারেন নি, নিজের পিতার জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকেও ধৈর্য এবং দৃঢ় মনোবল দান করুন, মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ মুকার্‌রম সৈয়দ তানভীর শাহ্ সাহেবের। তিনিও কানাডার স্যাসকাটুনের (Saskatoon) অধিবাসী। তিনি সম্প্রতি প্যারাগুয়েতে মৃত্যুবরণ করেন। সেখানে তিনি ওয়াক্‌ফে আরযীর উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তারও একমাত্র পুত্র সৈয়্যদ রেযা শাহ্ জামাতের মুরব্বী। তানভীর শাহ্ সাহেবের মাতা ফররুখ খানম সাহেবা তুর্কিস্তান থেকে তার ভাই হাজী জুনুদুল্লাহ্ ও তার মায়ের সাথে কাদিয়ানে বয়আতের জন্য এসেছিলেন। তার ছেলে লিখেছেন, আমার দাদা সৈয়্যদ বশীর শাহ্ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত সৈয়্যদ আব্দুস্ সাত্তার শাহ্ সাহেব (রা.)'র দৌহিত্র ছিলেন। এভাবে হযরত উম্মে তাহেরের সাথেও তার আত্মীয়তা ছিল। মরহুম জামা'তের খুবই বিশ্বস্ত সদস্য ছিলেন। তানভীর শাহ্ সাহেব সর্বদা জামা'তের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। তার ছেলে লিখেন, জামা'তের অনুষ্ঠানাদীতে অবশ্যই আমাদের নিয়ে যেতেন। প্রত্যেক শুক্রবার রীতিমত স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে (আমাদেরকে) জুমুআয় নিয়ে যেতেন। আর্থিক কুরবানীকে অনেক গুরুত্ব দিতেন। সবসময় বেতনের একটা অংশ সেজন্য পৃথক করে রাখতেন। পরিবারের লোকদের এবং জামা'তের লোকদেরও সর্বদা এরূপ করতে বলতেন। তবলীগের গভীর আগ্রহ ছিল। প্রায়শ জামা'তের উত্তম তবলীগ করার পন্থা সম্পর্কে বলতেন। প্যারাগুয়েতে তার উপস্থিতিতে দুটি বয়আত হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত স্বল্পেতুষ্ট ছিলেন। কখনো ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করতেন না এবং এজন্য তার কোনো আক্ষেপও ছিল না। বরং আল্লাহ্ তাকে যা দিয়েছেন সেজন্য (প্রভুর দরবারে) সদা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল ছিল অর্থাৎ যা প্রয়োজন আল্লাহ্ (ইনশাআল্লাহ্) পূর্ণ করবেন। কোনো সমস্যায় নিপতিত হলে বলতেন, দোয়া করো আল্লাহ্ সমস্যা সমাধান করে দিবেন আর আল্লাহ্ সমস্যা সমাধান করেও দিতেন। তার ছেলে বলেন, আমাকে বার বার বলতেন মুরব্বী হিসেবে তোমার দায়িত্ব অনুধাবন করো এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করো। তার স্ত্রী বলেন, উনচল্লিশ বছরের দাম্পত্য জীবন আমাদের, আমি তার মধ্যে কখনো কোনো দুর্বলতা দেখি নি। যুগ-খলীফার সাথে গভীর ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল আর সন্তানদেরকেও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতেন। সীরাতে মুস্তকীমে নিজেও চলতেন, সন্তানদেরকেও চালাতেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের দাম্পত্য জীবনে তিনি কখনো কারো কুৎসা করেন নি। শ্বশুরকূলের লোকদের প্রতি যত্নবান ছিলেন। আমার মায়ের যখনই আমার

প্রয়োজন পড়তো তিনি সানন্দে আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিতেন। প্যারাগুয়ের মুরব্বী আব্দুন্ নূর বাতেন সাহেব বলেন, কানাডাতে বিভিন্ন পদে থেকে তার (জামা'তের) সেবা করার সুযোগ হয়েছে। তার মাঝে অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কোনো দিক ছিল না। জামা'তের সেবায় গভীর আগ্রহী ছিলেন। যেখানেই যেতেন আবশ্যক দায়িত্ব জ্ঞান করে আগ্রহ ও ভালোবাসার সাথে পুরোপুরি দায়িত্ব পালন করতেন। প্যারাগুয়ে জামা'তের যুবকদের ওপর তার ব্যক্তিত্বের গভীর প্রভাব পড়েছিল। তিনি তাদেরকে ধৈর্য, দয়া ও আতিথেয়তা শিখিয়েছেন। রিজাইনা জামা'তের স্থানীয় প্রেসিডেন্ট হাবিবুর রহমান সাহেব বলেন, জামা'তের একান্ত নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন। সদা হাস্যবদনে থাকতেন। আমি কখনো তাকে রাগ করতে দেখি নি। খুব নম্রভাবে ও ভালোবাসার সাথে কর্মীদের থেকে কাজ আদায় করতেন। সেবার কারণে কখনো ক্লান্তিভাব দেখি নি। মনে হতো, তার মাঝে সর্বদা আপন প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের এক উন্মাদনা বিরাজ করতো। খিলাফতের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা ছিল।

প্যারুগুয়ের একজন নবদীক্ষিত ইলিয়াস অলিভার সাহেব বলেন, তার সাথে আমার অল্পকিছুদিনের পরিচয়। কিন্তু এই স্বল্পসময়ে তিনি আমার ও আমার বন্ধুদের জন্য এক মহান উত্তরাধিকার রেখে গেছেন অর্থাৎ তাদের জন্য যারা ইসলামে নবাগত। তার কাছ থেকে আমরা ধৈর্য শিখেছি, আমরা সর্বদা সাহায্যকারী, দয়াশীল ও উত্তম মানুষ হওয়া শিখেছি। তিনি আরো বলেন, মরহুম আমাদেরকে শিখিয়েছেন, কাউকে কিছু শেখানোর জন্য মুখে বলা আবশ্যক নয় বরং কার্যত সেবার মাধ্যমেই এ কাজ আমরা সম্পন্ন করতে পারি। (শেখানোর জন্য মুখে বলা আবশ্যক নয় বরং সেবার বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করো, এর ফলে লোকেরা শিখতেও পারে, তবলীগও হয়ে যায়)। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি দয়া ও ক্ষমাসূলভ আচরণ করুন এবং তার সন্তানদের ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন এবং তার পূণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দান করুন।

আরেকজনের স্মৃতিচারণ করছি, তিনি হলেন রানা মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ খান সাহেব। যিনি জামা'তের মুরব্বী ছিলেন। তিনিও সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি রানা আতাউল্লাহ্ খান সাহেবের সুপুত্র ছিলেন। এপ্রিলের শেষদিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা তার দাদা রানা আলাদ্বীন সাহেবের মাধ্যমে হয়, যিনি ১৯৩১ সনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র হাতে বয়আত করেছিলেন। বয়আতের পর তাকে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেই বিরোধিতার কারণে অনেকে ধর্মত্যাগ করেছিল। অর্থাৎ তার আত্মীয়স্বজন মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তিনি আহমদীয়তের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তবলীগ অব্যাহত রাখেন। রানা জাফর উল্লাহ্ সাহেব ১৯৮৭ সনে জামেয়া পাশ করেন এবং এরপর একাধারে ৩৬ বছর পর্যন্ত তিনি সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। বেশিরভাগ সময় তিনি মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন এলাকায় মুরব্বী হিসেবে সেবাদানের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। সৈয়্যদ নিয়ামত উল্লাহ্ সাহেব আফগানী, যিনি বর্তমানে ঘানার মুরব্বী, তিনি বলেন, পেশাওয়ারের চিনী পায়া– যেখানে আমরা আফগানিস্তান থেকে হিজরত করে এসেছিলাম, মরহুম সেখানে মুরব্বী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এটি সম্ভবত ১৯৯৯ বা ২০০০ সনের কথা হবে। নিতান্তই সাধাসিধে এবং অত্যন্ত বিনয়ী ও দরবেশ স্বভাবের মানুষ ছিলেন। কঠোর পরিশ্রমী ও মানবদরদী মানুষ ছিলেন। আফগানিস্তান জামা'তের প্রতি তার অনেক বড় অনুগ্রহ রয়েছে। তিনি বলেন (সৈয়্যদ নিয়ামত

উল্লাহ্ সাহেব), আমরা আফগানিস্তানের যে তিনজন মুরব্বী রয়েছি, তার কল্যাণেই আল্লাহ্ আমাদের মুরব্বী বানিয়েছেন।

দরিদ্রদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন, গোপনে দরিদ্রদের সাহায্য করতেন। তার সহধর্মিনী বলেন, তার মৃত্যুর সংবাদ শুনে অনেক এমন নারী-পুরুষ সমবেদনা জানানোর জন্য বাড়িতে আসেন যাদেরকে আমরা কেউই চিনতাম না। তারা একারণেও চিন্তিত ছিলেন যে, মুরব্বী সাহেব আমাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ভাতা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। নিজের আত্মীয়স্বজন ও কিছু দানশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে অর্থকড়ি নিয়ে তিনি দরিদ্রদের দিতেন। তার মৃত্যুর পর এখন আমাদের কী হবে?

তার জামাতা যিনি জামা'তের একজন মুরব্বী, তিনি বলেন; রানা মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ খান সাহেবের মত নিঃস্বার্থ মানুষ আমি অনেক কম দেখেছি! তিনি বলেন, আমি কোনো প্রকার আত্মম্ভরিতা ও অহংকার তার মাঝে কখনো দেখি নি। ক্ষমা করার ক্ষেত্রে সর্বদা এগিয়ে থাকতেন। ভুলটা অপরপক্ষের হলেও তিনিই প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিতেন। অত্যন্ত স্নেহশীল এবং সদা অন্যের উপকারে আসতেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি মা এবং স্ত্রী ছাড়াও তিন কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং (তার প্রতি) দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন। (আর) তার সন্তানদেরও তার পূণ্যকর্মসমূহকে অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দান করুন (আমীন)।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)